بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৯ জুলাই, ২০১৯ মোতাবেক ১৯ ওফা, ১৩৯৮ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

আজও বদরী সাহাবীদের স্মৃতিচারণ করা হবে। আজ প্রথমেই যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত আমের বিন সালামা (রা.)। হযরত আমের বিন সালামাকে আমর বিন সালামাও বলা হয়ে থাকে। বালী গোত্রের সাথে তার সম্পর্ক ছিল। বালী আরবের একটি প্রাচীন গোত্র কুযাআ-এর একটি শাখা, যা ইয়েমেনে অবস্থিত। এ কারণেই তাকে আমের বিন সালামা বালভীও বলা হয়। হযরত আমের আনসারদের মিত্র ছিলেন। হযরত আমের বিন সালামা বদর ও উহুদের যুদ্ধে যোগদানের সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

দ্বিতীয় যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সুরাকা। তার সম্পর্ক ছিল কুরাইশদের বনু আদী গোত্রের সাথে, যা হযরত উমর বিন খাত্তাবের গোত্র ছিল। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সুরাকার পঞ্চম পূর্বপুরুষে রেহা নামক ব্যক্তি পর্যন্ত গিয়ে হযরত উমরের সঙ্গে আর দশম পুরুষে কা'ব নামক ব্যক্তি পর্যন্ত গিয়ে মহানবী (সা.)-এর সাথে বংশবৃক্ষ মিলিত হয়। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সুরাকার পিতার নাম সুরাকা বিন মু'তামের আর তার মায়ের নাম আমা বিনতে আব্দুল্লাহ্ ছিল। তার বোনের নাম ছিল যয়নব, আর তার ভাই ছিলেন আমর বিন সুরাকা। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সুরাকার স্ত্রীর নাম ছিল উমায়মাহ্ বিনতে হারেস, তার গর্ভে তার সন্তান আব্দুল্লাহ্‌র জন্ম হয়। জীবনী রচয়িতাদের অধিকাংশই তাকে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বলে বর্ণনা করেছেন কিন্তু কয়েকজন বলেছেন, তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি বরং উহুদ ও পরবর্তী যুদ্ধ সমূহে যোগদান করেছিলেন। যাহোক, অধিকাংশের মতানুসারে হযরত আব্দুল্লাহ্ এবং তার ভাই আমর বিন সুরাকা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। হযরত আব্দুল্লাহ্‌র বংশধরদের মধ্যে আমর অথবা উসমান বিন আব্দুল্লাহ্, যায়েদ এবং আইঊব বিন আব্দুর রহমান এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

আব্দুল্লাহ্ বিন আবু বকর বর্ণনা করেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সুরাকা তার ভাই আমরের সাথে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন আর তারা উভয়ে হযরত রিফা' বিন আব্দুল মুনযের-এর ঘরে অবস্থান করেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সুরাকা (রা.) হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে ৩৫ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সুরাকা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, **'তাসাহ্হারু ওয়া লাও বিল মায়ে'** অর্থাৎ, পানি দিয়ে হলেও সেহ্‌রী খাও। অর্থাৎ সেহ্‌রী খাওয়া আবশ্যক আখ্যা দিয়েছেন।

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত মালেক বিন আবু খওলী (রা.)। হযরত মালেক বিন আবু খওলীর সম্পর্ক ছিল বনু ইজল গোত্রের সাথে, যারা কুরাইশদের বনু আদী বিন কা'ব গোত্রের মিত্র ছিল। আবু খওলী ছিল তার পিতার উপনাম, কিন্তু তার নাম ছিল আমর বিন যুহায়ের। হযরত মালেক এর নাম হেলালও বর্ণনা করা হয়। হযরত উমর (রা.) যখন মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন তখন হযরত উমরের পরিবারের অন্যান্য সদস্যের পাশাপাশি হযরত মালেক এবং তার সহোদর হযরত খওলীও সাথে ছিলেন।

হযরত মালেক তার সহোদর হযরত খওলীর সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আরেকটি উক্তি অনুসারে হযরত খওলী তার দুই ভাই হযরত হেলাল অর্থাৎ হযরত মালেক এবং হযরত আব্দুল্লাহ্‌র সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে হযরত মালেক বিন আবু খওলী (রা.) মৃত্যুবরণ করেন।

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত ওয়াকেদ বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.)। হযরত ওয়াকেদ এর পিতার নাম ছিল আব্দুল্লাহ্ বিন আবদে মানাফ। তার সম্পর্ক ছিল বনু তামীম গোত্রের সাথে। হযরত ওয়াকেদ খাত্তাব বিন নুফায়েল এর মিত্র ছিলেন। অপর এক উক্তি অনুসারে তিনি কুরাইশদের বনু আদি বিন কা'ব গোত্রের মিত্র ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.)-এর তবলীগি প্রচেষ্টার ফলে যেসব ব্যক্তিবর্গের ইসলাম গ্রহণের উল্লেখ ইতিহাস ও জীবনী-গ্রন্থে পাওয়া যায় হযরত ওয়াকেদ (রা.)ও তাদের অন্তর্ভুক্ত। মহানবী (সা.)-এর দ্বারে আরকামে যাওয়ার পূর্বেই হযরত ওয়াকেদ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। কিছুকাল পূর্বে দ্বারে আরকাম সম্বন্ধে আমি বর্ণনা করেছি যে, তা কি ছিল। (আজ পুনরায়) সংক্ষেপে উল্লেখ করছি। মহানবী (সা.)-এর মনে এই ধারণার উদয় হয় যে, মক্কায় একটি তবলীগি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন, যেখানে মুসলমানরা সমবেত হবে, নামায ইত্যাদির জন্য আসবে আর কোন বাঁধাবিপত্তির সম্মুখীন না হয়ে নিশ্চিন্তে নিজেদের তরবীয়তি বিষয়াদির ক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে নির্দেশনা লাভ করবে; অনুরূপভাবে সেই জায়গাকে কেন্দ্র করে ইসলামের তবলীগও করা যাবে। কাজেই এই উদ্দেশ্যে একটি ঘরের প্রয়োজন ছিল যা কেন্দ্রের মর্যাদা বা ভূমিকা রাখবে। অতএব মহানবী (সা.) একজন নবাগত মুসলমান আরকাম বিন আবি আরকাম এর ঘর পছন্দ করেন, যা সাফা পাহাড়ের পাদদেশে ছিল। এরপর মুসলমানরা এখানেই সমবেত হতো, এখানেই নামায পড়তো। আর যারা সত্যের সন্ধানে ছিল তারা যখন মহানবী (সা.)-এর কাছে আসতো তখন তিনি তাদেরকে এখানেই ইসলামের তবলীগ করতেন। এ কারণেই এই ঘরটি ইতিহাসে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছে আর দ্বারুল ইসলাম নামেও সুপরিচিত। মহানবী (সা.) প্রায় তিন বছর পর্যন্ত দ্বারে আরকামে কাজ করেছেন। অর্থাৎ নবুয়্যতপ্রাপ্তির চতুর্থ বছর তিনি এটিকে নিজের কেন্দ্র হিসেবে অবলম্বন করেন আর ষষ্ঠ বছরের শেষ পর্যন্ত তিনি এখানে বিভিন্ন তবলীগি ও তরবীয়তি কার্যক্রম পরিচালনা করেন। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন যে, দ্বারে আরকামে ইসলাম গ্রহণকারী সর্বশেষ ব্যক্তি ছিলেন হযরত উমর (রা.), যার ইসলাম গ্রহণ করার ফলে মুসলমানরা অনেক শক্তি লাভ করে আর দ্বারে আরকাম থেকে বেরিয়ে প্রকাশ্যে তবলীগ করা আরম্ভ করে। হযরত উমর (রা.) যখন মক্কা থেকে মদিনার উদ্দেশ্যে হিজরত করেন তখন হযরত উমরের পরিবারের অন্যান্য সদস্য ছাড়া হযরত ওয়াকেদও তাদের সাথে ছিলেন। হযরত ওয়াকেদ মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করার সময় হযরত রিফা' বিন আব্দুল মুনযের এর ঘরে অবস্থান করেন। এরপর মহানবী (সা.) হযরত ওয়াকেদ এবং হযরত বিশর বিন বারা (রা.)-এর মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন রচনা করেন। হযরত ওয়াকেদ বদর, উহুদ এবং পরিখার যুদ্ধসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। মহানবী (সা.) যখন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ-এর নেতৃত্বে একটি সেনাদল প্রেরণ করেন তখন তাতে হযরত ওয়াকেদও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই অভিযানে কাফেরদের এক ব্যক্তি আমর বিন হাযরামী নিহত হয় যাকে হযরত ওয়াকেদ হত্যা করেছিলেন। ইসলামের (ইতিহাসে) সে প্রথম মুশরিক ছিল যে নিহত হয় আর হযরত ওয়াকেদ প্রথম মুসলমান ছিলেন যিনি কোন মুশরিককে কোন যুদ্ধে

হত্যা করেছেন। এই অভিযান বা যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ এর স্মৃতিচারণে আমি বর্ণনা করেছি। হযরত উমর (রা.)'র খিলাফতকালের প্রথমদিকে হযরত ওয়াকেদ (রা.) মৃত্যু বরণ করেন।

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো, হযরত নসর বিন হারেস (রা.)। হযরত নসর বিন হারেস আনসারদের অওস গোত্রের বনু আব্দ বিন রায্যাক এর সাথে সম্পর্ক রাখতেন। তার নাম নুমায়ের বিন হারেসও বর্ণনা করা হয়। তার উপনাম ছিল আবু হারেস। তার পিতার নাম হারেস বিন আব্দ এবং মায়ের নাম সওদা বিনতে সওয়াদ ছিল। হযরত নসর বিন হারেস বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। তার পিতা হারেস (রা.)'ও মহানবী (সা.)-এর সাহাবী হওয়ার সম্মান লাভ করেছিলেন। হযরত নসর কাদসিয়ার যুদ্ধে শহীদ হন। কাদসিয়া ইরান অর্থাৎ বর্তমান ইরাকের একটি স্থান, যা কুফা থেকে পঁয়তাল্লিশ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। আর চতুর্দশ হিজরীতে হযরত উমর ফারুক (রা.)'র খিলাফতকালে মুসলমান আর ইরানীদের মাঝে কাদসিয়া নামক স্থানে চূড়ান্ত যুদ্ধ হয়েছিল, যার ফলশ্রুতিতে ইরানী সামাজ্য মুসলমানদের করতলগত হয়েছিল।

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত মালেক বিন আমর। তাঁর সম্পর্ক ছিল বনু সুলায়েম গোত্রের বনু হাজর বংশের সাথে আর তিনি বনু আবদে শামস এর মিত্র ছিলেন। তার পিতার নাম ছিল উমায়ের বিন সুমায়েদ। হযরত মালেক নিজের দুই ভাই হযরত সাক্ফ বিন আমর এবং হযরত মুদলাজ বিন আমর-এর সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। হযরত মালেক উহুদ এবং অন্যান্য যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সহযোদ্ধা ছিলেন আর ১২ হিজরী সনে ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হন।

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত নো'মান বিন আসর। তার সম্পর্ক ছিল আনসারদের বালী গোত্রের সাথে এবং তিনি বনু মুআবিয়া গোত্রের মিত্র ছিলেন। তাকে লাকীত বিন আসরও বলা হতো। অনুরূপভাবে তাকে নো'মান বিন বালভী নামেও উল্লেখ করা হতো। হযরত নো'মান বিন আসর আকাবার বয়আত, বদরের যুদ্ধ এবং একইভাবে অন্যান্য সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। কারো কারো মতে হযরত নো'মান ছিলেন সেই ব্যক্তি যাকে মহানবী (সা.) এর ইন্তেকালের পর মুরতাদদের সাথে যুদ্ধে তুলায়হ্ শহীদ করেছিল।

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত উয়ায়েম বিন সায়েদা। তার সম্পর্ক ছিল অউস গোত্রের শাখা বনি আমর বিন অউফ এর সাথে। হযরত উয়ায়েম আকাবার প্রথম এবং দ্বিতীয় উভয় বয়আতে অংশগ্রহণ করেন। সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে যে উদ্ধৃতি রয়েছে সে অনুযায়ী আকাবার প্রথম বয়আতের পূর্বে মদিনার আনসারদের একটি দল মহানবী (সা.) এর প্রতি ঈমান আনয়ন করেছিল, যাদের সংখ্যা ছিল ছয়, আর কতিপয় রেওয়ায়েতে আটজনেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। তাদের মাঝে হযরত উয়ায়েম বিন সায়েদাও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাবাকাতুল কুবরায় লিখিত আছে যে, মদিনায় হিজরতের সময় মহানবী (সা.) হযরত উয়ায়েম বিন সায়েদার সাথে হযরত উমরের, আর মতান্তরে হযরত হাতেব বিন আবি বালতাহ-এর ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের (রা.) বর্ণনা করেন যে, তিনি মহানবী (সা.) কে বলতে শুনেছেন, উয়ায়েম বিন সায়েদা আল্লাহ্ তা'লার বান্দাদের মধ্য থেকে কতই না উত্তম বান্দা! আর তিনি জান্নাতের অধিবাসীদের একজন। এক রেওয়ায়েত অনুসারে আয়াত

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ (সূরা তওবা: ১০৮)

যখন অবতীর্ণ হয় তখন মহানবী (সা.) বলেন, উয়ায়েম বিন সায়েদা, যিনি কতই না উত্তম বান্দা, তিনিও তাদের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ এই আয়াতের অনুবাদ হলো, এতে আগমনকারী এমন লোকও আছে যারা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়ে যাওয়ার বাসনা রাখে। আর আল্লাহ্ তা'লা পূর্ণ পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের পছন্দ করেন। فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ।

হযরত উয়ায়েম বিন সায়েদা বদর, উহুদ এবং পরিখাসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। আসেম বিন সুয়ায়েদ বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত উয়ায়েম বিন সায়েদার কন্যা উবায়দাকে এ কথা বলতে শুনেছেন যে, হযরত উমর বিন খাত্তাব যখন হযরত উয়ায়েম বিন সায়েদার সমাধিস্থলে দাঁড়িয়েছিলেন তখন তিনি বলেন, পৃথিবীতে কেউ এ কথা বলতে পারবে না যে, সে এ কবরে সমাহিত ব্যক্তির চেয়ে উত্তম। মহানবী (সা.)-এর জন্য যে পাতাকাই গাঁড়া হয়েছে উয়ায়েম তার ছায়াতলে থাকতেন। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, অজ্ঞতার যুগে হারেসের পিতা সুয়ায়েদ হযরত মুজাযযের-এর পিতা যিয়াদকে হত্যা করে। এরপর একদিন নিহত ব্যক্তির পুত্র হযরত মুজাযযের সুয়ায়েদকে পরাস্ত করেন এবং তিনি তার পিতার হত্যাকারীকে হত্যা করেন। এই উভয় ঘটনা ইসলামের পূর্বের আর এই ঘটনাই বুআসের যুদ্ধের কারণ ছিল যা অউস এবং খাযরাজ গোত্রের মাঝে সংঘটিত হয়েছিল। এরপর মহানবী (সা.) যখন মদিনায় আগমন করেন তখন নিহত উভয় ব্যাক্তির পুত্র অর্থাৎ হারেস বিন সুয়ায়েদ এবং হযরত মুজাযযের বিন যিয়াদ মুসলমান হয়ে যান অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করেন। আর উভয়েই বদরের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই রেওয়ায়েতের সত্যাসত্য যা-ই হোক, ঘটনাটি হলো, ইসলাম গ্রহণের পরও হারেস বিন সুয়ায়েদ পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য হযরত মুজাযযেরকে হত্যা করার সুযোগের সন্ধানে থাকত। কিন্তু সে সেই সুযোগ পায় নি। উহুদের যুদ্ধে কুরাইশরা যখন পুনরায় মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করে তখন হারেস বিন সুয়ায়েদ পেছন থেকে হযরত মুজাযযের-এর ঘাঁড়ে আঘাত করে তাকে শহীদ করে। অপর এক বক্তব্যে এটিও বলা হয়েছে যে, হারেস বিন সুয়ায়েদ হযরত কায়েস বিন যায়েদকেও শহীদ করেছিল। হামরাউল আসাদ যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে হযরত জিবরাঈল (আ.) মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে তাকে অবহিত করেন যে, হারেস বিন সুয়ায়েদ এখন কুবায় আছে, সে প্রতারণামূলকভাবে হযরত মুজাযযের বিন যিয়াদকে হত্যা করেছে, এবং মহানবী (সা.)-কে বলেন যে, আপনি হারেস বিন সুয়ায়েদকে হযরত মুজাযযের বিন যিয়াদের প্রতিশোধ হিসেবে হত্যা করুন। মহানবী (সা.) এই কথা শুনতেই তাৎক্ষণিকভাবে কুবায় যান, সাধারণত তিনি এই সময় যেতেন না, তখন কুবায় প্রচণ্ড গরম ছিল, তিনি সেখানে পৌঁছলে কুবায় বসবাসকারী আনসার মুসলমানরা তাঁর (সা.) কাছে এসে একত্রিত হয়ে যায়, যাদের মাঝে হারেস বিন সুয়ায়েদও ছিল, যে কিনা একটি বা দুটি হলুদ রঙের চাদর মুড়ি দিয়ে রেখেছিল। হযরত উআয়মার বিন সায়েদা মহানবী (সা.) এর নির্দেশে মসজিদে কুবার দরজায় হারেস বিন সুয়ায়েদকে হত্যা করেন। যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হচ্ছে তার নাম সীরাত হালাবিয়ায় উয়ায়েম এর পরিবর্তে উয়ায়েমার-ও লেখা হয়েছে। অথচ তাবাকাত ইবনে সাদ এবং অন্যান্য স্থানে তার নাম উয়ায়েম বিন সায়েদা-ই উল্লেখ করা হয়েছে। যাহোক অপর এক রেওয়ায়েতে এটিও রয়েছে যে, মহানবী (সা.) উয়ায়েম বিন সুয়ায়েদকে হত্যা করার নির্দেশ দেন নি, অর্থাৎ যে ব্যক্তি মুসলমানকে প্রতারণার মাধ্যমে শহীদ করেছিল তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেন নি। তারা উভয়েই মুসলমান ছিলেন।

হত্যার প্রতিশোধ হিসেবে হত্যা করা হয়েছে। দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) হযরত উসমানকে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন। একটি রেওয়ায়েতে এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, হারেস বলে, খোদার কসম, আমি মুজাযযেরকে হত্যা করেছি। কিন্তু এ কারণে নয় যে, আমি ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি আর না এজন্য যে, ইসলামের সত্যতায় আমার কোন সন্দেহ আছে। বরং এজন্য যে শয়তান আমার আত্মাভিমান ও আত্মসম্মানে সুড়সুড়ি দেয়। আর এখন আমি আমার এই কাজ থেকে খোদা ও তাঁর রসূল (সা.) এর সম্মুখে তওবা করছি এবং নিহতের রক্তপণ দিতে প্রস্তুত আছি। আমি অনবরত দুই মাস রোযা রাখব এবং একজন দাসকে মুক্ত করব। কিন্তু মহানবী (সা.) হারেসের এই ক্ষমা প্রার্থনাকে গ্রহণ করেন নি আর তাকে হত্যার শাস্তি দেয়া হয়। সীরাতুল হালাবিয়ার রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, আবু উমর বলেন, হযরত উয়ায়েম মহানবী (সা.) এর জীবদ্দশাতেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এটিও বলা হয় যে, তার মৃত্যু হযরত উমরের খিলাফতকালে ৬৫ বা ৬৬ বছর বয়সে হয়েছিল।

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত নো'মান বিন সিনান। তার সম্পর্ক ছিল আনসারদের খাযরাজ গোত্রের বনু নো'মান বংশের সাথে। ইবনে হিশাম লিখেছেন, হযরত নো'মান বনু নো'মান এর মুক্ত দাস ছিলেন। কিন্তু ইবনে সাদ তাকে বনু উবায়দা বিন আদী কর্তৃক মুক্ত দাস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। হযরত নো'মান বিন সিনান বদর এবং উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন।

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তিনি হলেন সুলায়েম-এর মুক্ত দাস হযরত আনতারা। হযরত আনতারা হযরত সুলায়েম বিন আমরের মুক্ত কৃতদাস ছিলেন। তিনি হযরত আনতারা সুলামী যাকওয়ানী ছিলেন এবং আনসারদের একটি শাখা বনু সওয়াদ বিন গানাম গোত্রের মিত্র ছিলেন। তিনি বদর ও উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি উহুদের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। তাকে নওফেল বিন মাআবিয়া দিলি শহীদ করেছিল। এক উক্তি অনুসারে, সিফ্ফীনের যুদ্ধে হযরত আলী (রা.)-এর খেলাফতকালে ৩৭ হিজরী সনে হযরত আনতারা মৃত্যুবরণ করেন।

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো, হযরত নো'মান বিন আবদে আমর। হযরত নো'মান বিন আবদে আমর আনসারদের খাযরাজ গোত্রের শাখা বনু দিনার বিন নাজ্জারের সদস্য ছিলেন। তার পিতার নাম ছিল আবদে আমর বিন মাসঊদ এবং মাতার নাম ছিল সুমায়রা বিনতে কায়েস। হযরত নো'মান বিন আবদে আমর বদর এবং উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। বদরের যুদ্ধে তার ভাই যাহ্হাক বিন আবদে আমরও তার সহযোদ্ধা ছিলেন। হযরত নো'মান বিন আবদে আমর উহুদের যুদ্ধে শাহাদতের মর্যাদা লাভ করেছেন। হযরত নো'মান এবং হযরত যাহ্হাকের তৃতীয় এক ভাইও ছিলেন, যার নাম ছিল কুতবা। তিনিও মহানবী (সা.)-এর সাহাবী হওয়ার সম্মান লাভ করেছেন। বি'রে মঊনার ঘটনায় হযরত কুতবা শাহাদত বরণ করেন। মুহাম্মদ বিন সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বনু দিনারের এক মহিলার পাশ দিয়ে যান, যার স্বামী, ভাই এবং পিতা মহানবী (সা.)-এর সাথে উহুদের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন আর তারা সবাই শাহাদত বরণ করেছিলেন। এই মহিলাকে যখন তাদের মৃত্যুর জন্য সমবেদনা জানানো হয় তখন সেই মহিলা জিজ্ঞেস করেন যে, মহানবী (সা.)- কেমন আছেন ? মানুষ উত্তরে বলে, হে অমুকের মা! তিনি ভালো আছেন, আর আলহামদুলিল্লাহ্ তেমনই আছেন যেমনটা আপনি

আকাঙ্ক্ষা করেন। উত্তরে সেই মহিলা বলেন, আমাকে দেখাও, আমি তাঁকে দেখতে চাই। তখন রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর দিকে ইশারা করে সেই মহিলাকে দেখানো হয়। সেই মহিলা মহানবী (সা.) কে দেখে বলে, তিনি ভালো থাকলে বাকী সকল সমস্যা তুচ্ছ।

অপর এক বর্ণনায় সেই মহিলার পুত্রেরও শহীদ হবার উল্লেখ পাওয়া যায়। হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) বর্ণনা করেন, উহুদের যুদ্ধে যখন এই গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে শহীদ করা হয়েছে, তখন মদিনাবাসী অনেক ভীতত্রস্ত ছিল। এমনকি মদিনার অলিতে-গলিতে চিৎকার-আহাজারি শুরু হয়ে গিয়েছিল। তখন এক আনসারী মহিলা হন্তদন্ত হয়ে ঘর থেকে বের হয়ে সামনে ভাই, পুত্র আর স্বামীর লাশ দেখতে পান। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জানি না প্রথমে সেই মহিলা কাকে দেখেছিলেন, কিন্তু যখন তিনি শেষ লাশের পাশ দিয়ে যায় তখন জিজ্ঞেস করেন যে, এরা কারা? উত্তরে লোকেরা তাকে বলে, এরা হলো তোমার ভাই, তোমার স্বামী এবং তোমার ছেলে। সে জিজ্ঞেস করে, মহানবী (সা.)-কেমন আছেন? মানুষ বলে, তিনি সামনে আছেন। সেই মহিলা হেঁটে হেঁটে মহানবী (সা.)-এর কাছে পৌঁছে যান এবং মহানবী (সা.)-এর আঁচল নিজ হাতে নেন এবং বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত, আপনি নিরাপদ থাকলে অন্য কোন ক্ষতির আমি পরোয়া করি না। এক বর্ণনা অনুসারে এই মহিলার নাম ছিল সুমায়রা বিনতে কায়েস যিনি নো'মান বিন আবদে আমর-এর মা ছিলেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একস্থানে এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, সাহাবীদের মাঝে এরূপ বীরত্বের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বস্তুবাদী লোকদের ক্ষেত্রে কোটি কোটি মানুষ আর শত শত দেশের মাঝে হয়ত দু-একটি এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। কিন্তু মাত্র কয়েক হাজার সাহাবীর মাঝেও এরূপ শত শত উদাহরণ পাওয়া যায়। কত উচ্চমার্গের এই দৃষ্টান্ত! যা একজন নারীর সাথে সম্পর্কযুক্ত। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, বেশ কয়েকবার আমি এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছি। এই উদাহরণ আমি নিজেও এখানে কয়েকবার উপস্থাপন করেছি, যা সকল বৈঠকেই শোনানোর যোগ্য এবং স্মরণ রাখার যোগ্য। কতক ঘটনা এমন অসাধারণ হয়ে থাকে, যা বারংবার শোনানোর পরও পুরোনো হয় না। এই মহিলার ঘটনাটিও এমনই যিনি উহুদের যুদ্ধের সময় মদিনায় এ সংবাদ শুনতে পান যে, মহানবী (সা.) শহীদ হয়ে গেছেন। তিনি মদিনার অন্য মহিলাদের সাথে উদ্বিগ্ন অবস্থায় (মদিনার) বাহিরে বেরিয়ে আসেন। তিনি যখন উহুদ থেকে ফিরে আসা প্রথম আরোহীকে দেখতে পান তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, মহানবী (সা.)-কেমন আছেন? উত্তরে সে বলে, তোমার স্বামী নিহত হয়েছে। তিনি বলেন, আমি তোমাকে রসূলুল্লাহ্ (সা.) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি আর তুমি আমাকে আমার স্বামীর সংবাদ দিচ্ছো! সে পুনরায় বলে, তোমার পিতাও নিহত হয়েছে। কিন্তু সেই মহিলা বলেন, আমি তোমাকে মহানবী (সা.) সম্বন্ধে প্রশ্ন করছি আর তুমি আমার পিতার অবস্থা বলছো! সে আরোহী ব্যক্তি বলে, তোমার দুই ভাইও মারা গিয়েছে। কিন্তু সেই মহিলা পুনরায় এটিই বলেন যে, তুমি আমাকে তাড়াতাড়ি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, আমি আমার আত্মীয়স্বজনের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছি না, বরং আমি মহানবী (সা.) সম্বন্ধে জানতে চাচ্ছি। সেই সাহাবীর হৃদয় যেহেতু প্রশান্ত ছিল আর তিনি জানতেন যে, মহানবী (সা.) ভালো আছেন তাই তার নিকট এই মহিলার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল তার আত্মীয়স্বজনের মৃত্যু সম্পর্কে তাকে অবগত করা। কিন্তু এই মহিলার নিকট সবার্ধিক প্রিয় বিষয় ছিল মহানবী (সা.)-এর সত্তা, তাই তিনি ধমকের সুরে

বলেন, তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। এর উত্তরে সে বলে, মহানবী (সা.) ভালো আছেন। একথা শুনে সেই মহিলা বলেন, মহানবী (সা.) জীবিত থাকলে আমার আর কোন দুঃখ নেই, (এরপর) যে কেউ মরুক না কেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) কোন ঘটনার উল্লেখ করেন এবং বলেন, এটি স্পষ্ট যে, এই দৃষ্টান্তের বিপরীতে সেই বৃদ্ধার দৃষ্টান্তের কোন গুরুত্ব নেই, যার সম্পর্কে স্বয়ং সংবাদদাতা স্বীকার করে যে, তার হৃদয় দুঃখকষ্টে ভারাক্রান্ত মনে হচ্ছিল। সে (অর্থৎ অন্য ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত মহিলা) মনে মনে কাঁদছিল কিন্তু প্রকাশ করে নি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, কিন্তু এই মহিলা সাহাবীর ঘটনা এমন নয়। এমন নয় যে, তিনি নিজেকে সংবরণ করে রেখেছিলেন আর মনে মনে কাঁদছিলেন এবং প্রকাশ করছিলেন না। বরং এই মহিলা সাহাবী তো মনে মনেও আনন্দিত ছিলেন যে, মহানবী (সা.) জীবিত। এই মহিলার মনে অবশ্যই কষ্ট ছিল, যদিও সে তা প্রকাশ করতে চায় নি। তার এই বর্ণনায় তিনি যে মহিলারই উল্লেখ করেছেন অথবা যখন তিনি এটি বর্ণনা করেছেন সে যুগে পত্রিকায় তা ছাপা হয়েছিল। কিন্তু এই মহিলা সাহাবীর হৃদয়ে তো কোন দুঃখও ছিল না। আর এটি এত চমৎকার এক দৃষ্টান্ত, যার কোন উদাহরণ পৃথিবীর ইতিহাস উপস্থাপন করতে পারবে না। আর (তোমরাই) বলো! এমন লোকদের সম্পর্কে যদি এটি বলা না হতো যে, فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ (সূরা আহযাব: ২৪) তাহলে পৃথিবীতে আর কোন জাতি ছিল যাদের সম্পর্কে এই বাক্য বলা যেতে পারে? হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমি এই মহিলার ঘটনা পড়ার সময় তার জন্য আমার হৃদয় সম্মান ও শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ হয়ে যায় আর আমার মন চায় আমি এই পবিত্র মহিলার আঁচল ছুঁয়ে তারপর আমার হাত আমার চোখে বুলাই, কেননা তিনি আমার প্রেমাস্পদের জন্য স্বীয় ভালোবাসার এক অতুলনীয় স্মৃতি রেখে গেছেন।

পুনরায় এই প্রেম ও ভালোবাসার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে আরেক স্থানে তিনি এভাবে বলেন যে, দেখো! রসূলে করীম (সা.)-এর প্রতি এই মহিলার কত গভীর ভালোবাসা ছিল? মানুষ তাকে একের পর এক পিতা, ভাই এবং স্বামীর মৃত্যু সংবাদ দিতে থাকে কিন্তু তিনি প্রতিবার উত্তরে এ কথাই বলে যাচ্ছিলেন যে, আমাকে বল– মহানবী (সা.)-এর অবস্থা কী? মোটকথা তিনিও একজন মহিলাই ছিলেন যিনি মহানবী (সা.)-এর প্রতি এতটা গভীর ভালোবাসার প্রকাশ করেছেন।

পুনরায় তিনি এ প্রসঙ্গে অন্য একস্থানে আরো বলেন, তোমরা নিজেদের মানসপটে এ অবস্থার একটি চিত্র অংকন কর। তোমাদের প্রত্যেকেই মৃত্যুপথযাত্রী মানুষ দেখে থাকবে, কোন না কোন আত্মীয় মৃত্যুবরণ করে। কেউ তার মাকে, কেউ তার বাবাকে, কেউ ভাইকে বা বোনকে মারা যেতে দেখে থাকবে। সেই দৃশ্য একটু স্মরণ কর যে, কীভাবে স্বীয় প্রিয়জনের সম্মুখে আর ঘরে ভালো ভালো খাবার রান্না করিয়ে এবং খেয়ে, চিকিৎসা করিয়ে এবং সেবা করিয়ে মৃত্যুবরণকারীদের অবস্থা কেমন হয়ে থাকে আর কীভাবে বাড়িতে কিয়ামত সংঘটিত হয় আর মৃত্যুবরণকারীদের নিজের মৃত্যু ছাড়া অন্য কোন কিছুর চিন্তাই থাকে না। কিন্তু মহানবী (সা.) স্বীয় সাহাবীদের হৃদয়ে এমন ভালোবাসা সৃষ্টি করেছিলেন যে, মহানবী (সা.)-এর বিপরীতে অন্য কোন কিছু নিয়ে তাদের কোন মাথাব্যথাই ছিল না। কিন্তু এই ভালোবাসা কেবল এজন্য ছিল যে, তিনি আল্লাহ্ তা'লার প্রিয়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি তাদের ভালোবাসার কারণ হলো, তিনি (সা.) ছিলেন আল্লাহ্ তা'লার প্রিয়। তাঁর মুহাম্মদ (সা.) হওয়ার কারণে তাঁর প্রতি ভালোবাসা ছিল না, বরং তাঁর রসূলুল্লাহ্ হওয়ার কারণে এই ভালোবাসা ছিল। অতঃপর তিনি বলেন, তারা মূলত আল্লাহ্ তা'লার প্রেমিক ছিলেন আর

যেহেতু আল্লাহ্ তা'লা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে ভালোবাসতেন তাই তাঁর সাহাবীগণ তাঁকে ভালোবাসতেন। আর কেবল পুরুষরাই নয় বরং মহিলাদের প্রতিও লক্ষ্য কর, তাদের হৃদয়েও তাঁর (সা.) প্রতি কীরূপ প্রেম ও ভালোবাসা ছিল। এরপর তিনি সেই মহিলার এই ঘটনাও বর্ণনা করেন। অতঃপর তিনি বলেন, এই ভালোবাসাই ছিল যা আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর জন্য তাদের হৃদয়ে সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা আল্লাহ্ তা'লাকে সবকিছুর ওপর প্রাধান্য দিতেন আর এই তৌহীদ তথা একত্ববাদই তাদেরকে পৃথিবী'র সর্বত্র বিজয়ী করেছে। আল্লাহ্ তা'লার বিপরীতে তারা পিতামাতারও পরোয়া করতেন না আর ভাই-বোনেরও না আর স্ত্রী'দেরও না এবং স্বামীদেরও না। তাদের সম্মুখে একটিই জিনিস ছিল আর তা হলো, তাদের খোদা যেন তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। একারণেই আল্লাহ্ তা'লা তাদের জন্য رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ বলেছেন। তারা আল্লাহ্ তা'লাকে সকল জিনিসের ওপর অগ্রগণ্য করেছেন আর আল্লাহ্ তা'লাও তাদের'কে অগ্রগণ্য করেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে মুসলমানদের এই অবস্থা বলবৎ থাকে নি। বর্তমানে আল্লাহ্ তা'লার সাথে তাদের সম্পর্ক যদি থেকে থাকে তবে তা কেবল কাল্পনিক বা মাথার মাঝে সীমাবদ্ধ। মন-মস্তিষ্কে অবশ্যই আছে যে, আমরা আল্লাহ্ তা'লাকে মানি, তৌহিদ বা একত্ববাদে বিশ্বাসী কিন্তু এটি তাদের হৃদয়ের কথা নয়। তাদের সম্মুখে যদি মহানবী (সা.)-এর নাম নেয়া হয় তখন তাদের হৃদয়ে ভালোবাসার তন্ত্রীগুলো আন্দোলিত হতে থাকে। মহানবী (সা.)-এর প্রিয়জনদের কথা বললেও তা স্পন্দিত হয়। শিয়া-সুন্নী সবাই মহানবী (সা.) এবং তাঁর সন্তানদের কথা আসলে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার স্মরণে মুসলমানদের হৃদয়-তন্ত্রীগুলো স্পন্দিত হয় না অথচ মহানবী (সা.)-এর ন্যায় নেয়ামত আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লাই দান করেছেন। তাই আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা এবং আল্লাহ্‌র নাম আসা মাত্র এমন এক উত্তেজনা আমাদের হৃদয়ে সৃষ্টি হওয়া উচিত কেননা প্রকৃত উন্নতি আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসার মাধ্যমেই অর্জিত হবে, তৌহিদ তথা একত্ববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকলেই অর্জিত হবে। অতএব এটি হলো সেই মৌলিক নীতি যা আমাদের প্রত্যেকের স্মরণ রাখা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে নিজেদের মাঝে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা এবং তার সঠিক উপলব্ধি দান করুন।

এখন আমি কতক মরহুমের উল্লেখ করব আর নামাযের পর তাদের জানাযাও পড়াব। প্রথম স্মৃতিচারণ হবে করাচি জামা'তের আমীর মুকাররম মওদুদ আহমদ খান সাহেবের যিনি মুকাররম নবাব মাস'ঊদ আহমদ খান সাহেবের পুত্র ছিলেন। গত ১৪ জুলাই তারিখে ৭৮ বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। ১৯৪১ সালের ১২ এপ্রিল তারিখে তিনি কাদিয়ানে মুকাররম মাস'ঊদ আহমদ খান সাহেব এবং সাহেবযাদী তাইয়্যেবা সিদ্দীকা সাহেবার ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হযরত নবাব মোবারেকা বেগম সাহেবা এবং হযরত নবাব মোহাম্মদ আলী খান সাহেবের পৌত্র এবং হযরত ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেবের দৌহিত্র ছিলেন। তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল.এল.বি ডিগ্রী অর্জন করেন এবং কিছুকাল হযরত শেখ মুহাম্মদ আহমদ মাযহার সাহেবের সাথে প্র্যাক্টিসও করেন। এরপর আর্ডিগনাম নামক একটি প্রসিদ্ধ ল'ফার্মের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে ঢাকা চলে যান। সেখানে তিনি তার কাজ চালিয়ে যান আর প্রায় ৫২ বছর সেই কোম্পানির সাথে যুক্ত থাকেন, বরং সিনিয়র পার্টনার ছিলেন। তিনি পাকিস্তানের সিনিয়র কর্পোরেট উকিলদের মাঝে গণ্য হতেন। তিনি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক নীতি, ব্যাংকিং ও কর্পোরেট আইনের বিশেষজ্ঞ ছিলেন এবং এ দৃষ্টিকোণ থেকে তার বেশ খ্যাতি ছিল। পাকিস্তানের কিছু কর্পোরেট আইনও তিনি প্রণয়ন

করেছেন। বড় বড় কোম্পানির পক্ষ থেকে তাকে ডাইরেক্টরশিপ গ্রহণের প্রস্তাব দেয়া হতো কিন্তু তিনি তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাতেন আর বলতেন, এসব পদে মানুষ নিজে কিছু না করলেও অন্যদের কারণে দুর্নীতির অভিযোগ লেগে যায় আর এভাবে এটি জামা'তের দুর্নামের কারণ হতে পারে, তাই আমি এগুলো এড়িয়ে চলবো।

তার স্ত্রী ছাড়াও তিনি দু'জন সন্তান রেখে গেছেন, একজন পুত্র, অপরজন কন্যা। তার পুত্রও আইন পেশার সাথে সম্পৃক্ত আর কন্যা নিজ স্বামীর সাথে কানাডায় বসবাস করছেন। তার স্বামী অর্থাৎ মওদুদ খান সাহেবের জামাতা মুকাররম সাহেবযাদা মির্যা মুবারক আহমদ সাহেবের পৌত্রির পুত্র। মওদুদ আহমদ খান সাহেব ১৯৯৬ সালের অক্টোবর মাসে করাচী জেলার আমীর মনোনীত হন। এর পূর্বে তিনি নায়েব আমীর এবং সেক্রেটারী উমুরে খারেজা হিসেবে সেবা করেছেন। তিনি ফযলে উমর ফাউন্ডেশন, নাসের ফাউন্ডেশন, তাহের ফাউন্ডেশনের ডাইরেক্টরও ছিলেন আর ১৯৮৪ সালে জামা'ত যে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিল তখন কাজের সুবাদে সংবাদ মাধ্যমের সাথেও তাঁর যথেষ্ট ভালো সম্পর্ক ছিল। তার স্ত্রী হলেন আমাতুল মু'মিন সাহেবা। তিনি মরহুম মালেক উমর আলী সাহেবের কন্যা। তার মায়ের নাম ছিল সৈয়্যদা সাঈদা বেগম, যিনি হযরত মীর মুহাম্মদ ইসহাক সাহেবের কন্যা ছিলেন। তিনি বলেন, মওদুদ সাহেব খুবই সাদাসিধে প্রকৃতির, সৎ চরিত্রের অধিকারী, সহানুভূতিশীল, বিনয়ী এবং স্নেহপরায়ণ মানুষ ছিলেন। যার সাথেই তার সম্পর্ক ছিল তারা সবাই একথাই বলতো যে, এমন মনে হতো যেন আমাদের সাথে তার বহু বছরের পরিচিতি বা সম্পর্ক, তা সে জামা'তের ক্ষুদ্র কর্মকতাই হোক বা জ্যেষ্ঠ সদস্যই হোক। এরপর তিনি আরো বলেন, এমন একটি দিকও নেই যাতে আমি কোনভাবে স্বামী বা পিতা হিসেবে তার ভূমিকায় কোন ঘাটতি দেখেছি। আদর্শ স্বামী ছিলেন, আদর্শ পিতা ছিলেন এবং আদর্শ মানুষ ছিলেন আর প্রত্যেকেই তার আচরণে খুবই প্রভাবিত হতো। তার ছেলে মামুন আহমদ খান বলেন, তিনি আদর্শ পিতা ছিলেন। শৈশবেই আমাদের মাঝে নামাযের অভ্যাস গড়ে তুলেছেন। খুবই ছোট বয়স থেকেই আমাকে নিজের সাথে ফজরের নামাযে নিয়ে যেতেন এবং বড়দের সম্মান ও সেবা করার উপদেশ দিতেন। আমাদের দুই ভাইবোনের ওপর তার বেশ ভালো প্রভাব রয়েছে, বিশেষভাবে তার নামাযের প্রতি একনিষ্ঠতা আর দ্বিতীয়ত তার আর্থিক কুরবানীর। আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রেও তিনি প্রথম সারিতে ছিলেন। তিনি বলেন, আমরা যখন রাবওয়া যেতাম তখন তিনি আমাদেরকে বেহেশতী মাকবেরায় নিয়ে যেতেন এবং বুযুর্গদের কবর ও সাহাবীদের কবরের কাছে নিয়ে গিয়ে আমাদের কাছে তাদের পরিচয় তুলে ধরতেন। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন, আত্মমর্যাদাবোধেরও অধিকারী ছিলেন, দরিদ্রদের সাথে খুবই বিনয়ের সাথে সাক্ষাৎ করতেন। কিন্তু কোন বড় অফিসারের সাথে নিজের উন্নতির স্বার্থে বা নিজের কোন উপকারের উদ্দেশ্যে সাক্ষাৎ করতেন না, বরং তাদের সামনে নিজের আত্মমর্যাদা বজায় রাখতেন। তার স্ত্রী বলেন, আমি তাকে রসিকতা করে বলতাম, আপনি সাধারণ মানুষের সাথে খুবই সুন্দরভাবে সাক্ষাৎ করেন কিন্তু যখন কোন বড় অফিসার সামনে আসে তখন আপনি বিশেষ এক আত্মমর্যাদাবোধ নিয়ে থাকেন, তখন মনে হয় যেন আপনার নবাবী মাথাচাড়া দেয়।

সিন্ধু প্রদেশের কারাবন্দিদের জন্য তিনি অনেক কাজ করেছেন। সেখানে শহীদ পরিবারগুলোর জন্য যথেষ্ট কাজ করতেন। তার স্ত্রী বলেন, এসব সফরে আমাকেও সাথে নিয়ে যেতেন। সেসব পরিবারের যত্ন নিতেন, তাদের উপহার-উপঢৌকন প্রদানের ব্যবস্থা

করতেন। আতিথেয়তার গুণ তার মাঝে অনেক বেশি ছিল, যার উল্লেখ প্রত্যেক পত্র লেখকই করেছে। তার স্ত্রীও বলেন, কখনো কখনো দশ মিনিট পূর্বে ফোন আসতো যে, এতজন মেহমান আসছেন, খাবার প্রস্তুত কর। সবসময় ফোনেই অবগত করতেন সাথে সাথে ফোন রেখে দিতেন যেন কোন অজুহাত প্রকাশের সুযোগই না থাকে। খেলাফতের সাথে তার অগাধ শ্রদ্ধা , ভালোবাসা এবং আন্তরিকতার সম্পর্ক ছিল। তার পুত্র বলেন, আমাকে, আমার বোনকে এবং আমাদের অন্যান্য শিশু-কিশোরদেরও তিনি উপদেশ দিতেন যে, সপ্তাহে একবার অবশ্যই যুগ-খলীফাকে নিজের অবস্থা সম্পর্কে অবগত করে চিঠি লিখে ফ্যাক্স করতে হবে এবং এই সম্পর্ককে আরো দৃঢ় করতে হবে।

কিছুদিন পূর্বে অর্থাৎ দু'বছর হলো তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। চিকিৎসা চলতে থাকে আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সুস্থও হয়ে যান। তিনি আমাকেও লিখেছেন যে, চিকিৎসা ঠিক আছে আর আমি পুনরায় অফিসে যাওয়াও আরম্ভ করেছি। প্রায় অর্ধেকের বেশি কাজ করা শুরু করেছি। কিন্তু কিছুদিন পূর্বে আবার তার স্বাস্থ্য হঠাৎ খারাপ হয়ে যায়, মনে হয় হার্ট এটাক হয় যার ফলে আর প্রাণ রক্ষা হয় নি। যাহোক তার যখন ক্যান্সারের চিকিৎসা চলছিল তখন তার সম্পর্কে ডাক্তার বলেন, আমরা তার আচরণে খুবই প্রভাবিত হয়েছি। প্রথমত তিনি খুবই ধৈর্যশীল ও দৃঢ় মনোবলের অধিকারী, দ্বিতীয়ত তার সাথে কথা বলে জানতে পেরেছি যে, তিনি একজন বড় স্কলারও বটে। তার ছেলে বলেন, আমরা যখন যেতাম তখন আমাদের দেখে হাসপাতালের ডাক্তাররা সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যেতেন। অ-আহমদী যুবকরাও সমবেদনা জ্ঞাপনের জন্য আসে। এক যুবক আমাকে বলে যে, আমার জীবনে তার উত্তম চরিত্র ও মেন্টরশিপের বা দিকনির্দেশনার বেশ প্রভাব রয়েছে।

এরপর তার স্ত্রী বলেন, তার একটি বিশেষ গুণ হলো চাঁদা প্রদানের ব্যাপারে তিনি খুবই যত্নবান ছিলেন। তিনি বলেন, তার উপার্জন বেশ ভালো ছিল এবং তিনি বেশ বিত্তশালী ছিলেন, কিন্তু আমি কখনো তার আয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করিনি, কখনো জিজ্ঞেস করার কথা মনে হলেও সাহস হয়নি। কিন্তু কখনো কখনো চাঁদার তালিকায় চোখ পড়লে তখন বুঝা যেতে যে, তিনি কত চাঁদা দিচ্ছেন আর এ দৃষ্টিকোণ থেকে তার আয় কত। এছাড়া প্রয়াত ব্যক্তিবর্গের নামে দেয়া চাঁদারও একটি দীর্ঘ তালিকা ছিল। তিনি বলতেন, সংসারে খরচ হ্রাস করে জামা'তের জন্য অধিক কুরবানী কর। তিনি বলেন, কখনো কখনো আমার এমন মনে হতো যে, তিনি অধিক উপার্জন করেনই জামা'তকে বেশি বেশি দেয়ার জন্য। তিনি অভিযোগ করাকে চরম ঘৃণা করতেন। সবাই তার সম্পর্কে এ কথা বলে, আর আমি নিজেও এ কথার সাক্ষী। তিনি এটিকে অত্যন্ত ঘৃণা করতেন এবং সবাইকে নিষেধ করতেন। তার স্ত্রী বলেন, কখনো কারো বিরুদ্ধে কোন কথা শুনেন নি। একজনের কথা আরেকজনকে পৌঁছানোর একান্ত বিরোধী ছিলেন। একটি নসীহত যা তিনি বেশ কয়েকবার করেছেন তা হলো- জীবনে কারো কাছে কোন আশা রাখবে না, যা করার তা নিজ শক্তিবলে কর, যেন পরবর্তীতে কারো প্রতি কোনো অভিযোগ না থাকে। মেজর বশীর তারেক সাহেব বর্ণনা করেন যে, একবার তিনি তাকে বলেন, তিনিও তখন নায়েব আমীর বা অন্য কোন পদে ছিলেন, যাহোক, তিনি তাকে বলেন, আপনি খুব বেশি নমনীয় আচরণ করেন, প্রয়োজনে কিছুটা কঠোর হন, কোন কোন কাজে কিছুটা কঠোরতা প্রদর্শন করতে হয়। এতে তিনি (মওদুদ সাহেব) উত্তর দেন যে, আপনি একজন স্বেচ্ছাসেবীর প্রতি কীভাবে কঠোরতা প্রদর্শন করতে পারেন, যে নিজের মূল্যবান সময় বের করে জামা'তের সেবার জন্য এসেছে, তার সাথে কঠোর ব্যবহার কীভাবে

করতে পারেন! অতএব তিনি অত্যন্ত ভালোবাসা ও স্নেহের সাথে কাজ আদায় করেছেন। খোদ্দামরা এবং কায়েদ সাহেবরাও আমাকে লিখেছে যে, আমাদের কাছ থেকে অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে তিনি কাজ আদায় করতেন। খোদ্দামরা ডিউটিও করত। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে করাচী জামা'ত ডিউটিও দিতো, বরং কেন্দ্রের নির্দেশ ছিল যে, আমীরদের সাথে নিরাপত্তা প্রহরী থাকা উচিত। যার ফলে খোদ্দামগণ ডিউটিতে গেলে তিনি তাদের যত্ন নিতেন। তিনি তাদের বলতেন ঘরে পৌঁছে আমাকে ফোন করে জানাবে যে, নিরাপদে পৌঁছেছ কিনা। কায়েদ সাহেব লিখেন, কখনো আমার কাছে যদি নিজের বাহন না থাকতো তখন তিনি তার গাড়ি আমাকে দিয়ে দিতেন আর বলতেন যে, ঘরে নিয়ে যাও, যেন তুমি নিরাপদে ঘরে পৌঁছতে পার।

তার কন্যা বলেন, শৈশব থেকেই আব্বা আমাদের হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লার সত্তায় বিশ্বাস, খেলাফতের প্রতি নিষ্ঠার শিক্ষা দিয়েছেন এবং যুগ খলীফার প্রতি আনুত্যের অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আর এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য আমাদেরকে নসীহতও করতেন। অসুস্থতার সময়েও সরাসরি জলসার অনুষ্ঠান শুনেছেন। লাইভ স্ট্রীমে যুক্তরাষ্ট্রের জলসা শুনেন। আমাকে প্রতিদিন বলতেন যে, তুমিও শুন। জার্মানী এবং কানাডার জলসা যখন একসাথে হচ্ছিল, তখন তার মেয়ে যিনি কানাডায় থাকেন তিনি বলেন, আমি জলসায় এসেছি। তখন তিনি বলেন যে, আমি জার্মানীর জলসা শুনছি। খুতবা ইত্যাদি রীতিমত শোনার তার অভ্যাস ছিল। রমজান মাস খুব ভাবগাম্ভীর্যের সাথে পালন করতেন। এই মাসে কখনো কোথাও সফরে যাওয়ার প্রোগ্রাম করতেন না, যাতে রমজানের যে মর্যাদা রয়েছে তা অক্ষুণ্ন থাকে। এতে অনেক মানুষের জন্য শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে যারা ছোট ছোট বিষয়ে সফরের অজুহাত দাঁড় করায় আর রোযা ছেড়ে দেয়।

করাচীর একজন সাবেক মুরব্বী সৈয়্যদ হোসেন আহমদ, যিনি তার কাযিনও বটে, তিনি বলেন, করাচীতে অবস্থানকালে আমি যখন সেখানে মুরব্বী ছিলাম তখন আমেলা সভায় কোন কঠিন বিষয়ে অধিকাংশ সময় এটি বলতেন যে, এগুলো আল্লাহ্‌র কাজ, আমরা তো কেবল হাত লাগাবো, তাই আমাদের নিজেদের চেষ্টা পুরোপুরি করা উচিত। প্রত্যেক সাক্ষাৎকারীকে দাঁড়িয়ে স্বাগত জানাতেন, প্রত্যেক সাহায্যপ্রার্থীর আবেদন তিনি গভীর মনোযোগ সহকারে শুনতেন এবং পড়তেন আর যথাযথ ব্যবস্থা নিতেন। এতিম, বিধবা এবং দরিদ্রদের যথাসাধ্য সাহায্য করতেন। জামা'তের বাজেটে স্বল্পতা সত্ত্বেও তিনি (সাহায্য করার) কোন না কোন উপায় বের করে নিতেন।

করাচীর এক বোন মরিয়ম সামার সাহেবা বলেন, তিনি কেবল তার সন্তানদের জন্যই নয় বরং পুরো করাচী জামা'তের জন্য একজন স্নেহশীল পিতার মতো ছিলেন আর সবার আনন্দ-বেদনায় অংশীদার হতেন। সবার মঙ্গলের চিন্তা করতেন। অত্যন্ত বিনয়ী এবং বিচক্ষণ মানুষ ছিলেন। একবার কোন অনুষ্ঠানে তার নাম নবাব মওদুদ আহমদ খান লেখা হলে তিনি নিজের কলম দিয়ে নবাব শব্দটি কেটে দেন।

ভারপ্রাপ্ত নায়েব আমীর কুরাইশী মাহমুদ সাহেব বলেন, তিনি তার এমারতকালে অত্যন্ত স্নেহশীল এবং দয়ালু পিতার মতো করাচী জামা'তের সদস্যদের পথনির্দেশনা প্রদান করেন আর সর্বজনপ্রিয়, স্নেহশীল এবং শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ধৈর্যশীল, নম্র প্রকৃতি ও বিনয়ী স্বভাবের অধিকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তার ব্যক্তিত্বের একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল তার বিনয়ভাব। বড় হোক বা ছোট, ধনী হোক বা দরিদ্র, শিক্ষিত হোক বা অশিক্ষিত- সবার সাথে

অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে সাক্ষাৎ করতেন আর গভীর মনোযোগের সাথে তাদের কথা শুনতেন এবং তাদেরকে পরামর্শে ধন্য করতেন। ছোট হোক বা বড় যে-ই আসতো, নিজের আসন থেকে উঠে সাক্ষাৎ করতেন। জামা'তী দায়িত্ব পালন করার জন্য প্রতিদিন অনেক রাত পর্যন্ত বেশ কয়েক ঘন্টা অফিসে বসতেন এবং অর্পিত জামা'তী দায়িত্ব পালন করতেন। নিজ দপ্তর থেকে সোজা জামা'তের দপ্তরে যেতেন এবং রাত ১০টা পর্যন্ত সেখানে বসতেন। এরপর জামা'তের শিশু এবং তরুণদের শিক্ষা অর্জনে অনুপ্রাণিত করার অনেক চেষ্টা করতেন। আমীর হিসেবে তিনি প্রত্যেক বিভাগের সেক্রেটারীর সাথে, অধিকন্তু হালকা প্রেসিডেন্টদের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ রাখতেন এবং বিভিন্ন সময়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগের কাজে তাদেরকে পথ নির্দেশনা দিতেন। পাকিস্তানের আনসারুল্লাহ্‌র সদর সাহেব লিখেন, জামা'তের তালীম এবং তরবিয়তের জন্য তিনি অত্যন্ত চিন্তিত থাকতেন। তিনি বলেন, একবার আমি সেখানে ট্যুরে যাই, কর্মকর্তাদের রিফ্রেশার্স কোর্স ছিল; তিনি আমার কাছে আসেন আর অত্যন্ত বেদনাভরা কণ্ঠে আমাকে বলেন, আপনি রিফ্রেশার্স কোর্স করাতে করাচি এসেছেন, আমি আপনাকে শুধু এটা জানাতে চাই যে, আজ ফজরের নামাযে মসজিদে আমরা কেবল তিনজন আনসার উপস্থিত ছিলাম, অথচ মসজিদের কাছাকাছি অনেকগুলো বাসা রয়েছে আর সবার কাছে গাড়িও আছে, সহজেই ফজরের নামাযে আসতে পারে। এরপর তিনি বলেন, এই মিটিং-এ সব কর্মকর্তাই এসেছেন, আপনি তাদেরকে বুঝান, প্রথমত তারা যেন নিজেদের মাঝে পুণ্যময় ও পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন করে এবং ইবাদতের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেয় আর এরপর নিজেদের সন্তানসন্ততি ও তরুণ প্রজন্মের তালিম-তরবিয়তের ব্যাপারেও চিন্তা করে। তিনি বলেন, যখন তিনি এই কথাগুলো বলছিলেন তখন তার মাঝে এক বেদনা কাজ করছিল।

এরপর একজন ভদ্রমহিলা লিখেন, আমরা ভারতে যাচ্ছিলাম, অর্থাৎ কাদিয়ানে যাচ্ছিলাম। আমাদের সবার কাছেই কিছু না কিছু ভারতীয় মুদ্রা ছিল; প্রথমে আমাদের ধারণা এটিই ছিল যে, তা নিয়ে যাওয়ার অনুমতি রয়েছে, কিন্তু পরে বলা হয় যে, অনুমতি নেই। সবাইকে ফর্ম পূরণ করতে দেয়া হয়; ভারতীয় ইমিগ্রেশনের এক কর্মকর্তা তাদের বলেন, এমনিতে তো ভারতীয় মুদ্রা নিয়ে যাওয়ার অনুমতি নেই, কিন্তু আপনারা যদি ভুলবশত নিয়ে এসে থাকেন তাহলে কোন সমস্যা নেই, নিয়ে যান কিন্তু এই ফর্মে তা উল্লেখ করবেন না। কিন্তু আমীর সাহেব তার কথা মানেন নি, আর তার কাছে যে অর্থ ছিল তিনি তা ফর্মে উল্লেখ করেন অথচ তাঁর কাছে যে অর্থ ছিল তার পরিমাণও অল্প ছিল না, প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ হাজার রুপি ছিল। ইমিগ্রেশনের সেই কর্মকর্তা পুনরায় বলেন, এটা এখানে লিখবেন না, নতুবা আইনানুসারে আমরা সেই অর্থ জব্দ করতে বাধ্য। তারপরও তিনি পূর্ণ সততার সাথে ফর্মে সেই অর্থের উল্লেখ করেন এবং সানন্দে তাদেরকে পুরো অর্থ দিয়ে দেন যে, ঠিক আছে, তোমরা এটা জব্দ কর। ছাড়ের কোন সুযোগ নেন নি। আমি যেমনটা উল্লেখ করেছি, খোদ্দামরাও লিখেছে যে আমাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন, ডিউটি-প্রদানকারীদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন; আর এমনভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন যেন আমরা তার প্রতি কোন অনুগ্রহ করেছি। করাচির রিগ-রোডের আমীর ইমতিয়াজ হোসেন শাহেদ সাহেব বলেন, আমি যদি তার ব্যক্তিত্বকে কয়েক শব্দে বর্ণনা করতে চাই তাহলে যে বৈশিষ্ট্যগুলো সামনে আসবে সেগুলো হলো– দীনতা ও বিনয়, খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা এবং জামা'তের ব্যবস্থাপনার প্রতি সম্মান।

তিনি আরও বলেন, ২০১৬ সালে করাচিতে স্থানীয় আমীরের ব্যবস্থাপনা চালু হয় এবং আমীর হিসেবে তাকে নিযুক্তি দেয়া হয়। তিনি বলেন, আমি জেলা আমীর সাহেবের কাছে গিয়ে বললাম যে (আমার উপর) অনেক বড় দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। তখন তিনি আমাকে বলেন, গুরু দায়িত্ব তো বটেই, সবসময় স্মরণ রাখবেন– কখনো কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে, খলীফায়ে ওয়াক্তের কাছে দোয়ার জন্য চিঠি লিখবেন, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা কৃপা করেন; আর বলেন, আমিও এটাই করি। নিয়মিতভাবে প্রতি সপ্তাহে করাচির যেই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানই হতো বা কোন ঘটনা ঘটতো বা আর্থিক বছরের সমাপ্তি হতো, জুমুআর পূর্বে আমাকে অবশ্যই দোয়ার জন্য লিখতেন। খোদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদ বেলাল হায়দার টিপু বলেন, সূরা মুমিনূন আমীর সাহেবের কাছে খুবই প্রিয় ছিল; প্রায় সময় খোদ্দামুল আহমদীয়ার অনুষ্ঠানে যখন তিলাওয়াত হতো, আমাকে বলতেন- সূরা মুমিনূন তিলাওয়াত করান, এরপর খুব স্নেহের সাথে উপদেশও দিতেন যে, এই সূরা মন দিয়ে পড়বে, বিশেষভাবে এর প্রারম্ভিক অংশটুকু। তিনি বলেন, আজও যখন আমি ভাবি তখন আমার মন সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি নিজের নামাযের সুরক্ষার নিমিত্তে সবরকম বৃথা বিষয় এড়িয়ে চলেছেন, আর তিনি আমাদেরকে এক উন্নত দৃষ্টান্ত হয়ে দেখিয়েছেন যে, মুমিন কীভাবে সাফল্য লাভ করতে পারে। তিনি আরও বলেন, দ্বিতীয় যে উপদেশ আমার মনে আছে তা হলো– একদিন তিনি আমাকে নির্জনে খুব স্নেহের সাথে বলেন, আমার সারা জীবনের নির্যাস হলো– প্রতি সপ্তাহে খলীফায়ে ওয়াক্তকে অবশ্যই চিঠি লিখবে; আর খুব ভালোবাসার সাথে আমাকে এই কথাটি বোঝান এবং বলেন, আমি নিজেও এদ্বারা উপকৃত হচ্ছি। প্রকৃতপক্ষেই তার মাঝে খিলাফতের প্রতি গভীর আনুগত্য ছিল, আর গভীর শ্রদ্ধাবোধও ছিল। (হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর) খান্দানের একটি অনুষ্ঠান হয়েছিল যেখানে এমন কিছু কথা হয় যা পরবর্তীতে আমি জানতে পারি। তখন আমি তাকেও লিখেছি যে, আপনিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, এমনটি হওয়া উচিত ছিল না, আমি এমনটি আশা করি নি। প্রত্যুত্তরে তিনি প্রথমে ক্ষমা প্রার্থনা করেন তারপর তিনি আমাকে (আবার) লিখেন, আমি এ কথা ভেবে আনন্দিতও হয়েছি যে, আমরা স্বাধীন নই, আমাদেরকে বুঝানোর এবং তরবিয়ত করার কেউ আছেন। আর আমার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সম্পর্কে তিনি আমার চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন, আত্মীয়তা ছিল। খিলাফতের পূর্বে শ্রদ্ধার সম্পর্ক অবশ্যই ছিল কিন্তু খলীফা নির্বাচিত হবার পর তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আচরণ করতেন, বরং যখন আমি নাযেরে আলা হই অর্থাৎ খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) যখন আমাকে নাযেরে আলা নিযুক্ত করেন তখনও তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে ব্যবস্থাপনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে সকল অর্থে আমার সাথে বিশ্বস্ততা ও শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা এবং দয়ার আচরণ করুন। তার মর্যাদা উন্নীত করুন। তার সন্তানসন্ততিকেও তার পুণ্য ধরে রাখার তৌফিক দান করুন।

দ্বিতীয় জানাযা হলো খলীফা আব্দুল আযীয সাহেবের, যিনি কানাডা জামা'তের নায়েব আমীর ছিলেন। তিনি গত ৯ জুলাই তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ৮৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। জম্মু-কাশ্মীরের বিখ্যাত আহমদী খলীফা বংশের সাথে তার সম্পর্ক ছিল। তার পিতা হযরত খলীফা আব্দুর রহীম সাহেব, দাদা হযরত খলীফা নূরুদ্দীন সাহেব জম্মুনী এবং নানা হযরত উমর বখশ সাহেব তিনজনই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। তার দাদা কাশ্মীরের শ্রীনগরের খানইয়ার মহল্লায় হযরত ঈসা

(আ.)-এর কবর খুঁজে বের করার সৌভাগ্য হয়েছিল যার উল্লেখ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) স্বীয় রচনাবলীতে বহু স্থানে উল্লেখ করেছেন। তিনি কানাডা জামা'তের প্রাথমিক সদস্যদের একজন ছিলেন। ১৯৬৭ সালে তিনি পাকিস্তান থেকে কানাডায় স্থানান্তরিত হন। পেশায় তিনি একজন উকিল ছিলেন। এরপর সেখানে তিনি নিজের ল ফার্ম প্রতিষ্ঠা করেন। জামা'তকেও সবসময় আইনী বিষয়াদিতে সাহায্য-সহযোগিতা করতেন। কানাডা জামা'তে তার সেবাকাল অর্ধ শতাব্দিরও বেশি। তিনি কানাডার প্রথম ন্যাশনাল সদর এবং কাযা বোর্ডের প্রথম সদর ছিলেন। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তিনি কানাডা জামা'তের নায়েব আমীর হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। ২০১০ সালে তিনি হজ্জ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। অত্যন্ত মিশুক প্রকৃতির, সর্বজনপ্রিয়, সদা হাস্যোজ্জল, বিচক্ষণ, সঠিক মতামত দানকারী, ন্যায়-নিষ্ঠাপরায়ণ এবং বিশ্বস্ত মানুষ ছিলেন। স্বাস্থ্য দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও তার উপর অর্পিত দায়িত্ব শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত দৃঢ়মনমানসিকতা নিয়ে পালন করেছেন। খিলাফতের সাথে গভীর ভালোবাসা এবং বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। আমার পক্ষ থেকে যে নির্দেশনাই প্রদান করা হতো সর্বদা তা যথাসাধ্য পালনের চেষ্টা করতেন। আল্লাহ্‌র কৃপায় তিনি মূসী (ওসীয়্যতকারী) ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথেও ক্ষমা এবং অনুগ্রহপূর্ণ আচরণ করুন আর তার উত্তরসূরীদেরকেও ধৈর্য এবং মনোবল দান করুন অধিকন্তু তার পুণ্য কাজগুলিকে চলমান রাখার তৌফীক দান করুন।